দৈনিক ইনকিলাব
01 JAN 2008

ড ক্ট র এ স এ ম লু ৎ ফ র র হ মা ন

বাঙ্‌লাদেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার যুগোপযোগিতা

বাঙলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষানীতি, শিক্ষা-কার্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠদান পদ্ধতির কথা বলা হয়; তাহলে সেসবের সাথে শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষাখাতে ব্যয় এবং শিক্ষার মান জাতীয় বিষয়গুলোও ধরতে হবে। কাজেই বিষয়টি যে বিশাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। গত ১৯ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে এ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা বাঙলাদেশী শিক্ষা ব্যবস্থার এই বিশাল পরিপ্রেক্ষিত নিয়েই। ওই আলোচনায় এ দেশের প্রাইমারী শিক্ষার প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষা এবং আইটি শিক্ষাসহ কারিগরি শিক্ষার প্রতিও নজর দেয়া হয়েছে। 'এডুকেশনওয়াচ' নামক একটি সংস্থার জরিপের আলোকে বলা হয়েছে– 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় সংখ্যার দিক থেকে অগ্রগতি হলেও মান অতি নিম্ন পর্যায়ের।' তাই আশঙ্কা প্রকাশ করে লেখা হয়েছে– 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার এই অতি নিম্ন পর্যায়ের মান নিয়ে শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।' এ অবস্থা চলতে থাকলে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না।' শুধু তাই নয়, 'বাংলাদেশের মত দেশগুলোর প্রতি একুশ শতক যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে তা মোকাবেলা করার জন্য আধুনিক বিশ্বের উপযোগী শিক্ষায় সুশিক্ষিত জাতি গঠন করতে হবে, দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের পাশাপাশি জনশক্তি রফতানীর প্রয়োজনেও শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা অপরিহার্য।' 'শিক্ষার যুগোপযোগী মান নিশ্চিত করতে হবে' শিরোনামের ওই আলোচনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আরও বলা হয়েছে– 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা হল পরবর্তী শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। সঙ্গত কারণেই এই ভিত্তি যথেষ্ট মজবুত হতে হয়। তা না হলে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ শিক্ষায় বা কারিগরি শিক্ষায় যোগ্যতা ও দক্ষতা সঞ্চারিত হতে পারবে না।' (ঐ)।

তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন কোন পর্যায়ের কেন উন্নয়ন প্রয়োজন, তা মোটামুটি স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। সেই সাথে এও বলা হয়েছে যে, জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য; এ শিক্ষা উন্নয়ন, মানোন্নয়ন বা যুগোপযোগী শিক্ষা কেন বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ জানাতে বলা হয়েছে– 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বিপর্যয়ের কারণ– 'দুর্নীতি-আক্রান্ত ও দুর্বল শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা' সম্পাদকীয়তে এডুকেশনওয়াচের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে 'সরকারী ও ব্যক্তিগত খাত মিলে জাতীয় আয়ের শতকরা ২.২ ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়। অথচ প্রতিবেশী ভারতে এই হার ৩.৩ এবং নেপালে ৩.৪। এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা খাতে আমাদের ব্যয় প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে কম। সরকারী ব্যয়ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় নিতান্ত কম। তদুপরি দুর্নীতি, অপচয় ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়ের সুফল আরও কমে যায়।' ...তার ফলে, 'মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এই ব্যয় যথেষ্ট নয়।' অথচ 'জাতীয় বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাত মিলে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ দেয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে। আর সেই সাথে বলা হয়েছে– 'দুর্নীতি, অদক্ষতা অপচয় ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের কারণে এর দ্বারা যেটুকু অর্জন সম্ভব ছিল, তাও হচ্ছে না।' এরকম কেন হচ্ছে, কেন শিক্ষা ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত ও অগ্রগতি ঘটেনি। 'তা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখতে হবে', বলেও সম্পাদকীয় কলামে দাবী করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'জাতি এ আশঙ্কার মুখোমুখি হচ্ছে এ কারণেই যে, শিক্ষার মানোন্নয়নে যতটুকু মনোযোগ দেয়া অপরিহার্য ছিল, অতীতে কখনও তা দেয়া হয়নি।' (ঐ)।

২.

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে অল্পকথায় বলা যায়– বাঙলাদেশী শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা গলদ রয়েছে; তার ফলে এ দেশের শিক্ষিত 'জনশক্তি' অদক্ষ, দুর্বল ও মেধাহীন। এ দশা দূর করতে না পারলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙলাদেশীদের ভবিষ্যৎ হবে আরও অন্ধকার। সে দুর্দশা জাতিকে যাতে ঘিরে না ধরে তার জন্য সুপারিশ হল– (ক) শিক্ষার মানোন্নয়নে সকলকে মনোযোগ দিতে হবে। (খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে (গ) শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে দুর্নীতি, অপব্যয়, উদ্দেশ্যমূলক ব্যয় রোধ করতে হবে। (ঘ) আইটি শিক্ষাসহ কারিগরি শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে। (ঙ) আর উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি বলে কথিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে।

এবার উক্ত পাঁচটি বিষয়ে একে একে আলোচনা করে দেখা যাক ওগুলোর ভেতরে-বাইরে আরও কোন কথা, তত্ত্ব ও তথ্য আছে কিনা।

৩.

ক. শিক্ষার মানোন্নয়নে এ দেশের কোন সরকার কখনও মনোযোগ দেয়নি তা সত্য নয়। জনগণ এ বিষয়ে কখনও অসচেতন ছিলেন, তা বলা যায় না; স্মরণীয় যে, এ দেশের প্রত্যেকটি সরকার ক্ষমতায় বসার সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেয় এবং একটা করে শিক্ষা কমিশন গঠন করে। শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করে; শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশ সাধনের জন্য সরকারী বোর্ডের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে। তাছাড়াও আছে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের মত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাবার জন্য যে প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বই লেখা বা লেখানো ও ছাপানো কাজ আনজাম দিয়ে থাকে। এমনকি, গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে টেক্সট বুক বোর্ড তো ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান বাড়াতে ও মেধার বিকাশ ঘটাতে বইয়ের মলাটতক বদলে দিয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে এবার তো এ প্রতিষ্ঠান জাতির সংজ্ঞার্থ না দিয়েই 'জাতির পিতার প্রতিষ্ঠা' দিয়ে, লাখ লাখ বই ছেপে ফেলেছে। 'বিতরণ'ও করে দিয়েছে। তবু যদি বলা হয় 'শিক্ষার মানোন্নয়নে' সরকার মনোযোগী নয়, তবে তার সাথে একমত হওয়া চলে না। তবু কেন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ? এ কি শুধুই সরকারবিরোধী অপপ্রচার এবং বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা? তা যে নয়, সে কথা পরে আলোচনা করা হবে।

খ. দ্বিতীয় কথা হল– শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। অপরাপর দেশের তুলনায় বাঙলাদেশে এ ব্যয় খুবই কম। ব্যয় বাড়াতে হবে তা ঠিক। কিন্তু কোথায় কোথায় কোন কোন খাতে কি পরিমাণ ব্যয় বাড়ালে শিক্ষার উন্নয়ন ঘটবে, মান বৃদ্ধি পাবে, তা বলা হয়নি। তা সত্ত্বেও গত ৩৫ বছরের হিসাব নিলে দেখা যায় প্রতি বছরই বাজেটে শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাস্তবেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে ও হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে টেনে আনার জন্য তাদের আর্থিক সাহায্য সহায়তাও দেয়া হচ্ছে।

উপরের স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনারও চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। সবাই জানেন, চারদলীয় জোট সরকারের আমলে 'একমুখী শিক্ষা' প্রচলনের জন্য আড়াই হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য ব্যয় করা হয়েছে। অথচ সেই একমুখী শিক্ষা চালু করা যায়নি। একজন মাত্র লোকের বাধা সৃষ্টির কারণে। তিনি এবং তার অনুরাগী অনুসারীরা যে ধর্মবিরোধী একমুখী শিক্ষা চান, সরকারী একমুখী শিক্ষায়োজন সে রকম ছিল না বলেই উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়। সরকারের তরফ থেকেও ওই 'একমুখী শিক্ষা' কি এবং কেন; বিদ্যমান শিক্ষা ধারা থেকে তার ফারাক কতটুকু, আর কি রকম সেসব বিষয়েও কোন ব্যাখ্যা ছিল না। ফলে বিশাল অংকের অর্থ খরচের সবটাই ববাদ হয়।

আসলে গত পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ যত সরকার এসেছে এবং গিয়েছে তাদের কারো কোন নির্দিষ্ট যুগোপযোগী মৌলিক 'শিক্ষানীতি' ছিল না। সে নীতি এখনও নেই। কখনও তা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে কিনা তাতেও আছে ঘোর সন্দেহ। ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না তা স্পষ্ট।

গ. তৃতীয় কথা, শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে। তাহলে অপচয়, অপব্যয় ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যয়, সাদা কথায় অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি বন্ধ হবে, ঘুষ দেয়া নেয়াও থাকবে না। এ চিন্তা মহৎ সন্দেহ নেই। কথাগুলো চমৎকার। তাও কেউ না, কবুল করবে না। কিন্তু তা কি সম্ভব? প্রায় এক বছর চলে যাওয়ার মত হলেও বর্তমান দুর্নীতিবিরোধী সরকারের খোদ দুর্নীতি দমন কমিশনের হাল হকিকত কি? গত ২৫ ডিসেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে খবর বেরিয়েছে– 'দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে দুদকের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী।' খবরে বলা হয়েছে– 'তারা বিভিন্ন জনকে ভুয়া নোটিশ ইস্যু করছে। দুদকের আইডি কার্ড গলায় ঝুলিয়ে নিরীহ মানুষকে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। টেলিফোনে হুমকি দিচ্ছে। অর্থ, দাবী করছে। কখনও বা দুদক চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে দুদকের নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মামলা থেকে 'অব্যাহতি' দিয়ে দেয়ার পক্ষে তদবির করার জন্য মোটা অংকের অর্থ নিচ্ছে। দুদক কার্যকর হওয়ার পর থেকেই দুদকের এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নানা 'কৌশল অবলম্বন' করে তাদের 'দুর্নীতিবিরোধী অভিযান' বাস্তবায়ন করে চলেছেন। দুদকের হালই যদি এরকম হয় তাহলে আর সব প্রতিষ্ঠানের দশা কি তা সহজেই বোঝা যায়।

সে জন্যই বলছি 'দুর্নীতি দমন সম্ভব নয়'। বাঙলাদেশের সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ক'জন দুর্নীতির সাথে যুক্ত নন, তা বেছে বের করা কঠিন বৈকি! আর শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি সব থেকে বেশী হওয়া সত্ত্বেও গত এক বছরে বর্তমান সরকার ও তার দু'দক; সেদিকে এক পাও ফেলেনি। ফলে, গুরু ঠাকুররা যে যেখানে গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম পদে জাঁকিয়ে বসেছেন এবং এখনও বহাল তবিয়েতে বসে আছেন; তাদের গায়েগতরে ঠাণ্ডা বাতাসটুকুও না লাগায় তারা সর্ববিষয়ে তাদের আগের নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। এজন্য প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানের যদি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে গত ১৫ বছরের দুর্নীতি, অপচয়, অপব্যয়, উদ্দেশ্যমূলক ব্যয় ও নিয়োগ-পদোন্নতি এবং অন্যান্য বিষয়ের তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে তো বটেই অন্য কোন ক্ষেত্রেই কোন উন্নতি হবে না। এ কাজ আগামী এক মাসের মধ্যে শুরু করা জরুরী। শিক্ষার উন্নয়ন চাইলে এটা করতে হবে। সেই সাথে স্কুল লেভেল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরতক নানা দলমতের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে ছাত্রভর্তি, চাকরি, টেন্ডারবাজি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে সর্বদলীয় অঘোষিত গোপন 'সিন্ডিকেট' তৈরী হয়েছে তার বিলোপ ঘটাতে হবে। বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় সিন্ডিকেটেড দুর্নীতি, সিলেবাস তৈরী বা পাঠ্যসূচী নির্ধারণ, বিষয় নির্বাচন, শিক্ষক নির্বাচন, রুটিন গবেষণা, সেমিনার ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। তার ফলে, মেধার বিকাশ ও মানসম্পন্ন শিক্ষাদান তো দূরের কথা, সমগ্র শিক্ষাদান কর্মসূচী ব্যর্থ হচ্ছে। এমনকি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও এর বাইরে নেই। দুর্নীতি আজ মূলনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে সব জায়গাতেই।

এ দশা দূর করা যে একেবারেই সম্ভব নয়; তা নয়। কিন্তু তেমন মানুষকে অতীতেও কখনও দায়িত্ব দেয়া হয়নি। বর্তমানে দেয়া হচ্ছে না। ভবিষ্যতেও দেয়া হবে না বলেই মনে করি। কারণ গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরেই যারা দেশ চালাচ্ছেন– তাদের বগলে রয়েছে ইট। সে ইট বর্তমান সরকার সরাতে পারত; কিন্তু সেদিকে সরকার যাচ্ছে না। তাই শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে এ সরকারের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঘ. চতুর্থ কথা, আইসিটিসহ কারিগরি শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে। এটাও সুন্দর কথা। এ বিষয়ে বর্তমান সরকারও সচেতন দেখা যায়। ২৫ ডিসেম্বর আর একটি খবর থেকে জানা যায়, 'বিজ্ঞান ও তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা' বলেছেন– 'আগামী ৫ বছরে ১৫ হাজার আইসিটি গ্র্যাজুয়েট তৈরী হবে' (দেখুন দৈনিক আমার দেশ। তাং-২৫-১২-০৭/পৃঃ-১) খবরে বলা হয়েছে– 'এ কর্মসূচীর আওতায় মাত্র ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থানীয় বাজারে আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা অর্জিত হবে এবং প্রায় এগারো মিলিয়ন মার্কিন ডলার রফতানী আয় বৃদ্ধি পাবে'। (ঐ)। তা যদি পায়, তাহলে দেশ তাতে সমৃদ্ধ হবে এবং কাগিরি/আইসিটি শিক্ষার অগ্রগতি ঘটবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও যে দুর্নীতি, অপচয়, অদক্ষতা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষতিকর প্রবণতা মাথা তুলে দাঁড়াবে না, তা বলা যায় না। যেহেতু এটা শিক্ষাবিষয়ক কর্মসূচী, তাই শিক্ষাখাতের সকল উপসর্গই এক্ষেত্রেও মাথা তুলে দাঁড়াবে; তা বেমাক বলা যায়।

আইসিটি ও কারিগরী ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকাশ ঘটলে দেশে বিদেশে কিছু চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা হবে। কিন্তু জাতীয় জীবনে অকারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং মেধার বিকাশ কিভাবে হবে– সে প্রশ্ন থেকেই যায়। অধিকন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে (অন্যান্য ক্ষেত্রেও)। এমন একটা অবস্থায় বাঙলাদেশকে রাখা হয়েছে যা রবীন্দ্রনাথের কথায়– 'শিখাইবে পারিবে না করিতে প্রয়োগ'। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-বিদ্যা আমরা শিখব– শেখাবো। কিন্তু প্রয়োগ করার সুযোগ কেউ পাবো না। কাউকে দেয়া হবে না। তার প্রমাণ– হরিপুরের তেল উত্তোলন। বাঙলাদেশের গ্যাস-আহরণ। পারমাণবিক শক্তির অধিকারী না হয়েও 'পরমাণু শক্তির বিস্তারবিরোধী।'

চুক্তিতে স্বাক্ষরদান। ফলে, আমাদের তরুণ বিজ্ঞানীরা থিওরিটিক্যাল (নিউক্লিয়ার) ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে; কিন্তু 'ফিশন ফিউশন' নিয়ে গবেষণা করতে পারবে না। তা ঘটানোর সুযোগ পাবে না। নিউক্লিয়ার এনার্জি তৈরী করে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে কেউ কোন অবদান রাখতে পারবে না। তারা 'সাইনিং' বিদ্যালয় পণ্ডিত হবে। কিন্তু দেশের তেল-গ্যাস, সোনা-রুপা-কয়লা-ইউরেনিয়াম খুঁচে তোলার সুযোগ পাবে না। তা তুলবে বিদেশীরা। তাহলে ওইরকম বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন এবং মেধার বিকাশ হল কি হল না– তা কিভাবে জানা যাবে?

ঙ. পঞ্চমত উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের যে কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে বলা দরকার, যে বিশেষ ধারায় এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা অসঙ্গত ও অবস্তাব। এরকম প্রণালীতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা আরও একশ' বছর চালিয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটাবার কোশেশ করলেও তাতে কামিয়াব হওয়া যাবে না। শিক্ষা বোর্ডের মুরুব্বী হুজুরান প্রথম শ্রেণী থেকে দশম-একাদশ শ্রেণীতক যে পদ্ধতিতে, যে বিশেষ ধারায়, বিশেষ লাইনের নির্বাচিত ব্যক্তিদের দিয়ে যেসব বই লেখান ও ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে বাধ্য করেন; তার মধ্যে না আছে শাঁস; না আছে আঁশ। ওসব বই সময়োপযোগী নয়, জাতির মন-মানসিকতার সাথে সম্পর্কিত নয়। আগ্রহ-উদ্দীপকও নয়।

ওই দু'পর্যায়ে পড়াশোনা করতে এসে যারা ঝরে যায়, তারা তো বিপুল পয়সা খরচ, সময় খরচ, শ্রমের অপচয় থেকে বেঁচে যায়, কিন্তু যারা তারপরও টিকে থাকে এবং টাকার জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভিড় জমায়, তারা কি শিখে আসে সেটাই বিবেচ্য। তা এই তথ্য থেকে বোঝা যাবে যে, সম্প্রতি একটি পিএসসি পর্যায়ের বিশেষায়িত পরীক্ষার বাঙালা বিষয়ের খাতা দেখতে গিয়ে দেখেছি বহু পরীক্ষার্থী ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম চন্দ্র, মধুসূদন, নীরব, সাধারণ, গ্রহণ, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকা, ক্ষতিগ্রস্ত, মম, নিভৃতে, নিশীথিনী, মূল্য ইত্যাদি অসংখ্য প্রচলিত বানান লিখেছে– যথাক্রমে 'ইশ্বরচন্দ্র', বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসুধন/মধুসুদন, নিরব, সাধারন, গ্রহন, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকা, ক্ষতিগ্রস্থ, মমো, নিদ্রীতে, নিশিথিনী/নীশিথীনি, মুল্য ইত্যাদি। কেউ কেউ জনাব, সার্থক, ধ্বংস বানান লিখেছে– জ্বনাব, স্বার্থক, ধ্বংশ। একাধিক পরীক্ষার্থী 'আশ্চর্যান্বিত' শব্দটা লিখতেই পারেনি। লিখেছে– 'আশ্চার্যিত'। একজন 'উপসংহার' না লিখে লিখেছে– 'যবনিকা' (রচনার শেষাংশে)। এক পরীক্ষার্থী লিখেছে– 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচটি ছোটগল্পের নাথ (নাম) যথাক্রমে 'বণফুল', 'বৌরাণির হাট', সোনালি কাবিন', 'আরেক ফাল্গুন' 'সঞ্চিতা'। একটা খাতায় পাওয়া গেছে– 'সাফল্য'-এর বিপরীতে 'বিফল্য'। একাধিক পরীক্ষার্থী লিখেছে– 'পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ভিত্তিতে বিষাদ সিন্ধু রচিত।' কারও লেখায় আছে– 'বাংলা গদ্যের জনক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।' এসব পরীক্ষার্থীর শতকরা পঁচানব্বই জন 'বাংলাদেশের দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা' শিরোনামে রচনা লিখতে গিয়ে লিখেছে– 'বাংলাদেশে 'দূর্যোগ'/দুযোগ/দূযোগ' কত রকম, কি কি; দুর্যোগের কারণ কি, তার প্রতিকারে কি করণীয়, কোন কোন বছর এদেশে কি কি দুর্যোগ ঘটে– এ সব। আর প্রায় সবাই রবীন্দ্রনাথের 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/চুনী উঠল রাঙ্গা হয়ে' চরণ দু'টোর ভাবসম্প্রসারণ করতে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা' লিখেছে। কেউ কেউ লিখেছে– একুশের চেতনার কথাও। এ থেকেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আউটপুট কি তা স্পষ্ট। এরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী– এমএ পাস।

৪

যা হোক [illegible] ও কর্ণধারদের জানা-শোনা, জ্ঞান-গম্যি, বিদ্যা-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা, সাহিত্য-চেতনা, কাব্য-চেতনা, রাজনৈতিক-চেতনার আরও বিস্ময়কর প্রকাশ তাদের ওইসব পরীক্ষার খাতায় আছে, যা এ রচনায় পুরোপুরি তুলে ধরা সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও নেই। কারণ ওপরের ওই সামান্য আলোচনায় যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা থেকে স্পষ্ট যে, গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মেধাহীন রাজনীতিকরা সরকারে বসে প্রতি বছর শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেছেন, নানা পরিকল্পনা নিয়েছেন। প্রতি আমলে এক একটা শিক্ষা কমিশন বসিয়েছেন এবং এমন সব লোকদের দায়িত্ব দিয়েছেন, যাদের নিজেদেরই কোন মৌলিক চিন্তা-ভাবনা এবং মেধা-মননের পরিচয় জাতি কখনও পায়নি। কাজেই তারা 'থোড়-বড়ি-খাঁড়া' আর 'খাঁড়াবড়ি থোড়' ছাড়া আর কি করবেন? তারই পরিণতিতে আজ বাঙলাদেশী শিক্ষাক্ষেত্রে এই দশা। এদশা কোন্ কোন্ দুর্নীতি দূর করে বা দমন করে ঘোচানো যায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে কত লাখো-কোটি টাকা ঢেলে 'সঞ্চিতা' আর 'সঞ্চয়িতা' যে এক নয়, 'বিষাদ সিন্ধু' যে 'পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ' নিয়ে লেখা নয় এবং 'কাব্য-চেতনা আর 'রাজনৈতিক চেতনা' এক নয়– তা শেখানো যায়? এ অবস্থায় আইসিটিসহ কারিগরি বিদ্যার হাজারগুণ, লাখোগুণ বিকাশ ঘটলেও কি জাতির সোনার ছেলেরা 'ঈশ্বর' বানান 'ইশ্বর'রূপে, 'নীরব' বানান 'নিরব'রূপে, 'ভূমি', 'ভূমিকা' বানান 'ভুমি', ভুমিকা'রূপে লিখবে না? অবশ্যই লিখবে এবং আরও খারাপভাবে লিখবে।

তাহলে বাঙলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা ও মেরুদণ্ডহীনতার মূল যে 'অন্য কোথাও অন্য কোনখানে' তা বোঝার সময় এসেছে। কোন কমিটি-কমিশন বসিয়ে সেখানে পৌঁছা যাবে না। বাঙলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে হলে চাই একটি যুগোপযোগী রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং তদুপোযোগী শিক্ষানীতি। সেই সঙ্গে প্রয়োজন একই দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা অনুযায়ী সময়ে-উপযোগী, জাতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনের অনুকূলে পাঠ্যসূচী তৈরী। আর উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখে বিষয় নির্বাচন ও অর্থায়ন। এছাড়া সব থেকে বেশী প্রয়োজন– 'জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য' শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক থেকে অধিকতর মনোযোগ দান। একশ' বছর আগেকার 'রীডিং ম্যাটেরিয়ালস' বাদ দিয়ে নতুন 'রীডিং ম্যাটেরিয়ালস' পাঠ্যসূচীতে স্থান দান এবং পরীক্ষা, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে নতুন-পুরনোর সংমিশ্রণ। এছাড়া মৌখিক পরীক্ষা ও চাকরিতে ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রেও প্রচলিত ধারা ও ধরনের পরিবর্তন। এসব বিষয়ে যুগোপযোগী, জাতীয়তাবাদী ও মেধাসম্মত পরিবর্তন না ঘটলে বাঙলাদেশী শিক্ষা ব্যবস্থার কোন কার্যকর পরিবর্তন ঘটবে না। সে [illegible] কঠিন। কিন্তু অসম্ভব নয়।

বিঃ দ্রঃ লেখাটি সম্পর্কে মতামত জানানোর জন্য ৮৬২৮ যোগাযোগ কাম্য –লেখক।

আইসিটি ও কারিগরী ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকাশ ঘটলে দেশে বিদেশে কিছু চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা হবে। কিন্তু জাতীয় জীবনে অকারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং মেধার বিকাশ কিভাবে হবে– সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

● লেখক : গবেষক, প্রফেসর, ঢা